যুগান্তর

তারিখ 19 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মোঃ আবু সালেহ সেকেন্দার

পথভ্রষ্ট ছাত্র রাজনীতি আর কতদিন?

জাতীয় রাজনীতির নীতিহীনতা ও পথভ্রষ্টতা গ্রাস করেছে ছাত্র রাজনীতিকে। প্রতিদিন গণমাধ্যমগুলোর সংবাদের দিকে নজর দিলেই বিষয়টি চোখে পড়ে। তবে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির একটি পার্থক্য আছে। জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তরা সচরাচর প্রকাশ্য সংঘাত-সংঘর্ষে জড়ান না। পর্দার অন্তরালেই চলে প্রধানত তাদের নীতিহীনতা ও পথভ্রষ্টতার খেলা। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িতদের যেন তর সয় না। তারা নারমার কাটকাটে বিশ্বাসী। তাই সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিদিন নজর দিলে দেখা যাবে কোনো না কোনো ছাত্র সংগঠন সংঘাত-সংঘর্ষ অথবা টেন্ডারবাজি-চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। আর জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তরা যদিও কালেভদ্রে প্রকাশ্য ঢাস-সড়কি নিয়ে প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করে; তবে ওই ধাওয়াকারীদের কটি ঘাঁটলে দেখা যাবে, ওরা মূলত ছাত্র সংগঠনেরই কর্মী।

ওদের হয়তো ঠিক কর্মী বলা যথার্থ হবে না। কারণ কর্মী হতে হলে তাকে কোনো না কোনো ভালো কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। কাজেই হাতুড়ি-কিরিচ নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা করাকে অন্তত ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের কাজ হিসেবে অভিহিত করা যাবে না।

একটি গবেষণা প্রবন্ধের কাজে দেশের প্রধান কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্র, মেনিফেস্টো, সংগঠন সঙ্গীত পড়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। তাই সেদিন ওই বিষয়গুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম। দেখলাম, প্রতিটি সংগঠনের গঠনতন্ত্রে মৌলিক কিছু পার্থক্য বাদ দিলে প্রায় একই ধরনের কথা দেখা আছে। কিন্তু বাস্তবে কোনো সংগঠনই তাদের গঠনতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও অনুসরণ করে না। যদি তারা তা করত; তবে চিহ্নিত সন্ত্রাসী, ডাকাতরা কখনও ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব পর্যায়ে আসতে পারত না। ছাত্রলীগের সংগঠন সঙ্গীতের প্রথম দুটি লাইন পড়তে গিয়ে তাদের সাম্প্রতিক কারকর্মের কথা মনে পড়ায় বেশ হাসি পেল। সংগঠন সঙ্গীতের প্রথম দুই চরণ : 'শিক্ষা শান্তি প্রগতির নামে (মোরা) মুক্তির সৈনিক/ কাঁপিয়ে তুলব সাত্রা চরাচর (মোরা) কাঁপাব দিগ্বিদিক।' পাঠকরা নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, গত পাঁচ বছরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, গোদাগুলির মাধ্যমে গোটা দেশ, এমনকি বিশ্বও কাঁপিয়ে তুলেছে। বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাৎসরিক প্রতিবেদনও স্থান পেয়েছে।

ছাত্রশিবিরই ভরসা আর অন্যরা ধোয়া তুলসীপাতা, বিষয়টি এমন নয়। সাম্প্রতিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতার ওপর শিবিরের বর্বরোচিত হামলার ঘটনাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ঋণ কাটার জন্য এ সংগঠনটি ছাত্র সমাজের কাছে 'ঋণকাটা শিবির' নামে পরিচিত। যা হোক, ওই ঘটনার পর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখেছি। নিঃসন্দেহে ওই জঘন্য হামলাকারীদের বিচারের পক্ষে আমিও। তবে অবাক হই ছাত্রলীগের কোনো কর্মী কর্তৃক অন্য কোনো সংগঠনের কর্মীর ওপর হামলা হলে ওইসব নেতাকে চুপ থাকতে দেখে। রুয়েটে বামপন্থী একটি ছাত্র সংগঠনের নেতাকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা যখন প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছিল, তখন আমি আমার পরিচিত ছাত্রলীগ নেতাদের টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে দেখিনি অথবা ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জের ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমার বিভাগের ছোট ভাই আবু বকর নিহত হয়েছিল, তখন ওইসব নেতাকে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে দেখেছি। যদি প্রতিবাদ করতেই হয়; তবে সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত। ছাত্রলীগ যেমন অস্ত্রবাজদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতার দায়িত্ব দিয়ে ঠিক করেনি, তেমনি শিবিরও ওই অস্ত্রবাজ নেতার ওপর রক্তের অন্ধকারে অতর্কিত হামলা করে অন্যায় করেছে। উভয় সংগঠনের অপরাধ ভিন্ন ধরনের হলেও উভয় সংগঠনই অপরাধী।

ক্ষমতার বাইরে থাকার কারণে ছাত্রদলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা বিরল। তবে তারাও মাঝে মাঝে রণহুংকার দেয় নিজেদের মধ্যে সংঘাতে জড়িয়ে। ছাত্রদলকে মনে রাখতে হবে, পাঁচ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জনগণ প্রত্যাখান করেছে যেসব কারণে তার মধ্যে অন্যতম হল : বাংলাদেশে ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিজ দলের কর্মী হত্যা, বিশ্বজিতের মতো নিরীহ পথচারীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা ইত্যাদি ঘটনা। ছাত্রদল বিরোধী দলে থাকলেও যদি বর্তমান ছাত্রলীগের পথে হাঁটে; তবে জনগণের একবিন্দুও সময় লাগবে না তাদের প্রত্যাখান করতে। আর এ ঘটনাগুলোর প্রভাব মূল দল বিএনপির ওপরও পড়বে। ভোটের রাজনীতির হিসাব-নিকাশও তখন পাল্টে যেতে পারে।

এক বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডই আওয়ামী লীগের অনেক ভোট কেটে নিয়েছে। ওই ঘটনার প্রভাব প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পড়েছে। আমি এ বছরের প্রথমদিকে পঞ্চগড় ও নীলফামারীসহ উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলা সফর করেছিলাম। নীলফামারীর তিস্তা ব্যারাজের (স্থানীয় নাম ডালিয়া ব্যারাজ) কয়েক মাইল আগে খগেরহাট নামে এক প্রান্তিক গ্রামের ছোট এক বাজারে চা নাশতা করতে গাড়ি থামিয়েছিলাম। নতুন কয়েকজন আগন্তুক দেখে গ্রামের মানুষের উৎসুক দৃষ্টি আমাদেরও নজর কেড়েছিল। তারা আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে আমি বললাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক। এ কথা শুনেই একসঙ্গে কয়েকজন প্রশ্ন করে বসেছিল— ওহ! শাকিল আপনার ছাত্র? ওই স্মৃতি আমি আজও ভুলতে পারি না। এ রকম অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ায় একদিকে যেমন লজ্জা পেয়েছিলাম; অন্যদিকে অবাকও হয়েছি। এত প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষও বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামি শাকিলকে মনে রেখেছে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিভাগের নামসহ! ওই ঘটনা আমাকে আরেকটি চিন্তার খোরাক দিয়েছিল। তা হচ্ছে, আমরা যতই মনে করি না কেন, গ্রামের মানুষ দিন-দুনিয়া সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না; তা সর্বদা সত্য নয়। গ্রামের মানুষের ওপর ওই ঘটনা এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে, তারা ঠিকই ওই ঘটনা মনে রেখেছে, হয়তো রাখবে বছরের পর বছর। এসব মানুষ যখন আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে যাবে; তখন ব্যালটে সিল মারার আগে যদি বিশ্বজিৎকে হত্যার দৃশ্য মনে পড়ে যায়; তখন ভোটারের মনের অবস্থার পরিবর্তনও হতে পারে। এদিকটি কি আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ কখনও ভেবেছে?

ছাত্র সংগঠনগুলোর কাজকর্ম জনমনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যখন ছাত্র নেতা চাঁদা না পেয়ে ঘরের জানালা-দরজা খুলে নিয়ে যায় অথবা টেন্ডারবাজি করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়ে, তখন তা সারাদেশের মানুষের মধ্যে ওই সংগঠন ও মূল দলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। ছাত্রদের কাজ পড়ালেখা করা; টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ঘরের দরজা-জানালা খুলে নিয়ে যাওয়া নয়। কিন্তু নীতিহীন রাজনীতির এ যুগে ছাত্র নেতারা নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এইসব অপকর্মকে। এ কারণে কেউ যদি কোনো ইউনিটের নেতা নির্বাচিত হন, সেদিন থেকে তার জীবন ধারণের স্টাইলও পাল্টে যায়। কেন্দ্রীয় বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো হলের নেতা হলে পরদিনই তিনি ফিল্মি স্টাইলে গাড়ি থেকে ক্যাম্পাসে নামেন। যিনি দু'দিন আগে মাসের খরচের টাকা জোগাড় করার জন্য বড় ভাইদের পেছনে টিউশনি পেতে ঘুর ঘুর করেছেন, হঠাৎ করেই কোনো আদাদিনের আকস্মিক চেয়ারগের বদৌলতে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যান। নিজের পদ পাওয়ার বিষয়টি জনগণকে জানাতে নিজের ওই সদ্য হাতে আসা পয়সা খরচ করে কথিত জনগণ কর্তৃক নিজের গুণকীর্তন লিখে লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার ছাপিয়ে ক্যাম্পাস ভরে ফেলেন। একজন ছাত্র নেতা যিনি পুরোদস্তরই একজন ছাত্র, তিনি পোস্টার ছাপানোর হাজার হাজার টাকা কোথায় পেলেন— এ বিষয়টি নিয়ে কোনো ছাত্র সংগঠনকে কখনও আপত্তি উত্থাপন করতে দেখিনি। ওই অবৈধ টাকার উৎস বিষয়ে দুদক ও সরকার উভয়েই নীরব। এভাবে নীতিহীন ছাত্র রাজনীতি চলছে সগৌরবে।

দু'-একজন ভালো ছাত্র নেতা যে নেই, সে কথা অস্বীকার করব না। কিন্তু ওইসব নেতার পাতিনেতাদের ভাষায় 'কোনো খাওয়া নেই'। ওই নীতিবান ও আদর্শ মেধাবী ছাত্রদের যখন ছাত্র রাজনীতিতে 'খাওয়া হবে', তখনই সুস্থ ছাত্র রাজনীতির সুফল আমরা পাব। তখন সরকারের শেষ সময়ে ছাত্রলীগের মতো ক্ষমতাসীন কোনো দলের ছাত্র সংগঠনকে লন্যে হয়ে পদ দেয়ার জন্য ছাত্র খুঁজে বেড়াতে হবে না। কারণ তখন আদর্শে বিশ্বাস করে অথবা ভালোলাগা থেকেই ছাত্র সংগঠনের পদ গ্রহণ করতে চাইবে সবাই। আর কোনো ছাত্র সংগঠনের পদ গ্রহণ করলে কাউকে হল থেকে বের করে দেয়া হবে না বিধায় সরকার পরিবর্তন নিয়ে তাকে টেনশনেও থাকতে হবে না। এজন্য প্রথমে দরকার প্রশাসনিকভাবে কর্তৃপক্ষের হলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে মেধাই হবে সিট প্রাপ্তির যোগ্যতা। তখন ছাত্র নেতারা প্রথম বর্ষের নতুন আসা শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে বলবে— এই আমাদের গঠনতন্ত্র, মেনিফেস্টো। আমরা ছাত্রদের জন্য, দেশের জন্য এ কাজগুলো করতে চাই। তোমার ভালো লাগলে আমাদের দলে যোগ দিও। ওই ছেলেটি সব কয়টি ছাত্র সংগঠনের বিষয়ে পড়ালেখা করে তার যে দলে ইচ্ছা যোগ দেবে। তাকে কেউ বাধা দেবে না। হল থেকে তাকে কেউ তাড়িয়েও দেবে না। আমার এমন ভাবনা এখনকার প্রেক্ষাপটে অলীক মনে হতে পারে। কিন্তু এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন অসম্ভব নয়।

মোঃ আবুসালেহ সেকেন্দার : *শিক্ষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*
salah.sakender@gmail.com